শঙ্খচূড়ের ফণা

বিমান ঘোষ রায়

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

সাপকে নিয়ে গল্প কাহিনীর শেষ নেই। এদের অদ্ভুত দৈহিক গঠন, দেহের পেশীর সাহায্যে এদের বিচিত্র চলার ভঙ্গী, সরু লকলকে চেরা জিভ, পাতা বিহনী স্থির চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি এবং সর্পোপরি এদের বিচিত্র আচার, আচরণ চির রহস্যময় করে তুলেছে এ প্রাণীকে মানুষের কাছে। পৃথিবীর মানুষ সাপের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। ভয় স্বাভাবিকও অবশ্য। সাপের তীব্র হলাহল বিসএ মানুষের মৃত্যু ঘটায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। তবে সব সাপ-ই বিষধর নয় কিন্তু। বেশীর ভাগই বিষহীন। দূর্ভাগ্যের বিষয় অনেকেই বিষধর ও বিষহীন সাপ ভালো করে চেনে না। ফলে অনর্থক বিষহীন সাপের কামড়ে অহেতুক মারাও যায় অনেক সময় বহু মানুষ।

সাপকে নিয়ে বহু গল্পগাথাও প্রচলিত। বেশীর ভাগই অবশ্য মিথ্যা। যেমন, তক্ষক সাপের রাজা। অথচ সাপই নয় এ প্রাণী। বিষও নেই এদের। তবে সাপের রাজ হয় এরা কী করে। আবার সাপ চক্ষুঃশ্রবাও না কি। চোখ দিয়ে ওরা শুনতে পায়। সত্যি কি তাই? —আদপেই না। তেমনি সাপের মাথার মণি, দাঁড়াসের লেজে বিষ— কোনো ভিত্তি-ই নেই এ সবের। কিংবদন্তীর অন্যতম নায়ক কালনাগিনী। মনসামঙ্গলখ্যাত এই সাপের নাম শোনেননি এমন লোক এদেশে কমই আছে। কালনাগিনীর নাম শুনলে আঁতকে ওঠে সবাই। অথচ বিষ-ই নেই এই প্রজাতির সাপের।

সাপের কামড়ে মানুষ মরে ঠিকই। তেমনি সাপ আবার মানুষের বন্ধু। ইঁদুর খাওয়ার যম এরা। মাঠের ফসল, গোলাজাত শস্য খেয়ে নষ্ট করে ইঁদুর। এক জোড়া ইঁদুর বছরে ৮৮৮ টি শাবকের জন্ম দেয়। এই ইঁদুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সাপের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু সাপ আছে যারা মশার লার্ভা খেয়ে থাকে। সাপকে কাজে লাগিয়ে মশার সংখ্যাও রোধ করা যেতে পারে।

বিষধর সাপের বিষ থেকে নানাবিধ দূরারোগ্য ব্যাধির ঔষুধ তৈরি করা হয়। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে সাপের বিষের ব্যবহার প্রচুর। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সর্প সংরক্ষনের প্রয়োজন আছে। সাপ নিয়ে লেখকের নিজের আগ্রহও অসীম। বিশেষ করে ফণধর সাপের রাজকীয় সৌন্ধর্য্য আকর্ষন করে এ

লেখককে দারুনভাবে সর্পপরিবেষ্টিত শিলাইদহের পরিবেশে জন্মে ও বড় হয়ে ঐ প্রাণীকে নিয়ে লেখার ইচ্ছেকে রূপ দিতেই এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ। আশা করি পাঠকের মনোরঞ্জনে সহায়ক হবে লেখকের এ প্রচেষ্টা।

সাপ সম্পর্কে লিখতে লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁর দুই পুত্র অতনু ও অরুনাভর দ্বারা। সাপ নিয়ে জানতে আগ্রহের শেষ নেই এদের দু-জনের। পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'পুনশ্চ'-র কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়েকের সহযোগিতার ভুলবার নয়। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

জানুয়ারী ২০০০
কলকাতা

বিমান ঘোষ রায়

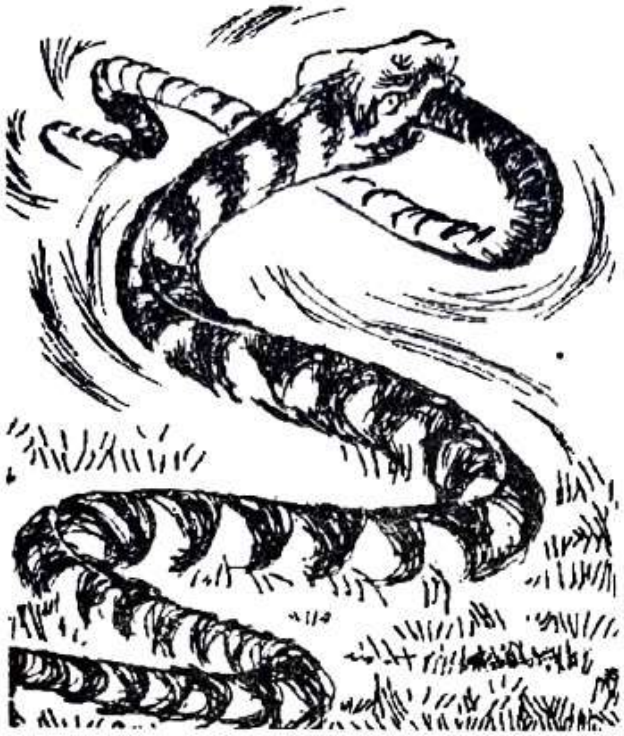

গল্পসূচী—

- ❋ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে ৯
- ❋ অপঘাত মৃত্যু ১৬
- ❋ ভুলের মাশুল ২১
- ❋ মুরগির ঘরে ভুজঙ্গের প্রবেশ ২৭
- ❋ গন্ধ শুঁকে বিচার ৩৪
- ❋ সত্যি ঘটনা ৩৯
- ❋ শিয়রে শমন ৪৩
- ❋ শঙ্খচূড়ের ফণা ৪৯
- ❋ সাপে বর ৫৬
- ❋ সাপের লেখা ৬১

উপস্থিত বুদ্ধির জোরে

বিনোদবাবুর বড়ো ছেলে কলকাতায় ওর কাকার কাছে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিছাটায় বাড়ি আসে। এলে হই-হই পড়ে যায়। মিশুকে , বুদ্ধিমান। কলকাতায় থাকতে থাকতে শহরের ছাপ পড়ে গেছে চেহারায়, কথাবার্তায়। বন্ধুদের কাছে সেইজন্য আলাদা খাতির ওর। কাছারিপাড়ায় সবার বাড়িতে বিনয়ের অবাধ যাতায়াত। প্রত্যেকের প্রিয়। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে কবিতাও লেখে আবার একটু আধটু। চমৎকার ছেলে।

গরমের ছুটিতে এবারে বাড়ি এসে নতুন ম্যানেজার বাবুর সাথে আলাপ হয় বিনয়ের। ভালো লাগে ওর ম্যানেজার বাবুকে। ম্যানেজার বাবুরও বিনয়কে খুব পছন্দ। চালাক চতুর ছেলে। সুন্দর কথা বলে। লেখাপড়ায়ও নাকি ভালো। আর ম্যানেজার গিন্নি তো বিনয় বলতে অজ্ঞান। ডেকে ডেকে এটা খাওয়ান, সেটা খাওয়ান। তা এরকম একটু আধটু করবেনই তো তিনি। শিলাইদার মতো এই অজ পাড়াগাঁয়ে বিনয় যেন মরুভূমিতে এক ফালি সবুজের ছোঁয়া। ম্যানেজার গিন্নি শহরের মানুষ। বিনয়কে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

ছুটিতে বিনোদবাবুর ছেলে বাড়ি এলে তবিলদ্দির খুব আনন্দ। গরমের ছুটি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যাবে তবিলদ্দি চাচার হরেক রকম সব প্রশ্ন। প্রায় প্রতিদিনই। বলবে, তা বিনোদদা ফুলুবাবু কবে আসতেছে? ছুটি মনে অচ্ছে ইবার এট্টু দেরিত, কি কন্? তা আম কাঠাল শ্যাষ হয়া গেলি ছুটি কী কামে আস্‌বিনি, কন্ আফ্‌নে।

নিবারণ মাষ্টারমশায়ও ফুলুর খোঁজ খবর নেন নিয়মিত। একটু নেকনজরে দেখেন। পড়িয়েছেন এইটুকু কাল থেকে। আলাদা চোখে দেখবেনই তাই। তবে মুশকিলে ফেলে দেন বেশি তবিলদ্দি চাচা। সবার সামনে ফুলুকে দেখিয়ে বিশেষ গর্বের সাথে বলবেন, কোলে উইঠ্যো ক-অ-তো মোত্‌য়েছ্ এই ছাওয়াল, বোজেছেন। ম্যানেজার বাবুকেও একথা বলা হয়ে গেছে তবিলদ্দি চাচার বেশ কয়েকবার।

চাচা বলেন, তা ফুলুবাবু, আমাগেরে সাথে বইস্যে গফ্‌প্পো-সপ্পো করো এট্টু আইজ। কঈলকাতার গফ্‌প্পো। আমরা শোনবো। কি কন মেনেজারবাবু।

—হ, ভালো কথা। বসো বিনয়, কঈলকাতার গল্প কও। শুনি।

ম্যানেজার বাবু এখনও আসরের অন্যদের মতো ফুলুকে ফুলু বলে ডাকতে শুরু করেননি। ভালো নামেই ডাকেন ওকে। তবিলদ্দি চাচা অবশ্য আদর করে ফুলুর সাথে

বাবু যোগ করেন একখানা। বলেন, তা ফুলুবাবু, কঈলকাতা শঅরে নাকি খালি জমি নাই অ্যাখ্ ফুটাও। সব বড়ো বড়ো দালান আর পাহা রাস্তা। দ্যাওয়া অলিও কাদা অয়না ওইহেনে। আর এই হেনে? এই হেনে দ্যাওয়া অ্যাক্‌ফুটা অতি না অতি কাদা তো না, গিরিস সরকারের দই অ্যাহেবারে।

—কঈলকাতার রাস্তার উসাড় কতো জানেন আফ্‌নে তবিলদ্দিভাই? —মধুবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—তা আর জানিন্যে, পুন্‌চাইশ্ আত। সাতখেন গাড়ি জাতি পারে পাশাপাশি, বোজেন ঠ্যালা।

—সা-আ-তখেন্? তালি মান্‌সি আটে ক্যাম্বা ওইহেনে। গাড়িই তো নামান রাস্তা নিয়ি নেছে।

—মান্‌সির আটার জন্যি ওইহেনে আলাদা রাস্তা লয়ছে, বোজেন না ক্যা। ওই রাস্তায় মান্‌সি-ই আটে খালি। গাড়ি জাতি পারে না। অ্যামুন আইন আছেন কনে আফ্‌নে।—তবিলদ্দি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বোঝান মধু বাবুকে।

—আচ্ছা ফুলু, তুমাগেরে কঈলকাতায় আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, আম্‌সব্‌রির গাছ এই সব কিছু নাই, না? তালি মান্‌সি আম কাঠাল এই সব পায় কনে?—রামপদ-র জিজ্ঞাসা যুক্তিসঙ্গত। সত্যিই তো তাই।

শ্যামাপদ বলেন, পুষ্করনি, বাঁশঝাড়, খাল বিল, জোঙ্গল-মোঙ্গল কিচ্ছু নাই ওইহেনে, কি কন? ব্যাপারডা বোঝেন তালি অ্যাখ্‌বার।

—ঠিক। আর সাপবাগ এই সব দ্যাখ্‌ফেন্ না আফনে ওইহেনে, বোজেছেন।—তবিলদ্দি জোর দিয়ে বলেন।

—বাগ নাই বোঝ্‌লাম কিনতুক সাপ নাই ক্যা?—মধু বাবুর প্রশ্ন।

—জোঙ্গল আছে নাকি ওইহেনে। কী কলাম তালি অ্যাতোক্‌খোন্ ধইর‍্যে। পাহা ঘরবাড়ি, পাহা রাস্তা, হুস্-হুস্ কইর‍্যে গাড়ি চলতেছে সব সুমায়। সাপ শান্তিতি থাক্‌তি পারে নাহি ওইহেনে?

ম্যানেজার বাবু মজা করে বলেন, না, শান্তিতে থাকতে পারেই না তো। আর শান্তিতেই যখন থাকতে পারেনা তাই থাকেও না অরা ওইখানে। ওই শহরে।

—ঠিক কয়ছেন।

ফুলু বলে, হ্যাঁ, কথাটা হয়তো ঠিক। কলকাতায় পথে ঘাটে সাপকে ঘুরতে দেখা যাবে না, মানছি। তবে তাই বলে একেবারে নেই, একথাও জোর দিয়ে বলা যাবেনা কিন্তু।

—তালি কওনা অ্যাখখেন্ গফ্‌প্পো ফুলুবাবু।

—না তবিলদ্দি চাচা, সাপের কোনো ঘটনা আমি জানিনা। দেখিওনি। শুনিওনি।

—তালি?

—তালি আবার কি।

—কোম কইর‍্যে অ্যাখ্‌খেন্ অনতোক্ পখ্‌খে কও। ওইহেনের না ওলি এইহেনের। নালি মান্‌সি কবি কি। মেনেজারবাবু তুমাক অ্যাতো বালোবাসেন। কও না সুনার ছাওয়াল অ্যাখ্‌খেন্ সাপের গফ্‌প্পো।

ম্যানেজারবাবুও উৎসাহ দেন। একটু ভেবেচিন্তে ফুলু বলে, আমার কোনো ঘটনা নয় তবে আমার মা ঘটনাচক্রে একবার একটা সাপ নিধন করে বসে। তাও আবার যে সে সাপ নয়। খোদ গোখরো একেবারে। রাজসাপ।

—সত্ত নাকি? গোক্ষুর সাপ মারছিলেন তোমার মায়, আশ্চর্য!—ম্যানেজারবাবু আকাশ থেকে পড়েন।

তবিলদ্দি অভিযোগ করেন, দ্যাখ্‌লেন তো মেনেজারবাবু, বিনোদদার কাণ্ড দ্যাখ্‌লেন। রোজ অ্যাতো অ্যাতো সাপের গফ্‌প্পো হচ্ছে। বিনোদদা শোনতেছেন বইস্যে বইস্যে। কিলতুক কই, উনি তো কলেন না কুনুদিন জে উনার পরিবার অ্যাতো বড্ডা অ্যাখ্‌খেন সাপ মারেছেন।

—না, মোটেই বড়ো নয়। ছোট্ট একরত্তি একটা সাপ।—বিনোদবাবু ব্যাখ্যা করেন।

—হৈলোই না হয় ছোটো, কিনতুক গুক্ষুর তো।—জমনাবিশবাবু বিনোদবাবুকে নিরস্ত করেন।

তবিলদ্দি আমিন বলতে থাকেন, আফ্‌নে আর কবেন না। অ্যাদ্দিন চুউপ মাইর‍্যে থাইক্ক্যে অ্যাহন কতি শুরু কইল্ল্যেন। না, আমরা ফুলুবাবুর থিহিই গফ্‌প্পোডা শোন্‌বো অ্যাহন। আফ্‌নে চুপ কইর‍্যে বসেন। ন্যাও, কতি থা হো তুমি, ফুলুবাবু।

মধুবাবু বলেন, অ্যাই শোনেন সবাই। কথা কবেন না কিন্‌তুক্ অ্যাহন জদুবাবু।

ফুলু বলতে শুরু করে, আমার মাকে একদা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

—কি রহম?

—আমরা তখন ছোটো। মা রান্নাঘরে রান্না করছিল একটা জলচৌকির উপর বসে। হঠাৎ এক গোখ্‌রোর বাচ্চা এসে হাজির সেখানে। কোথা থেকে যে উদয় হলেন তিনি কে জানে। তবে উদয় হয়েই তার সে একেবারে রণং দেহি মূর্ত্তি। ফর নাথিং কিন্তু। রণাঙ্গনে নেমেই দংশনোদ্যত ভঙ্গি তার একেবারে। ফণা তুলে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক্ করে ফেলেছে সে মূহূর্তের মধ্যে।

—লোখ্‌খোবশ্‌তু হলেন গিয়ে তো তুমার মা?—জমানবিশকাকু পরিষ্কার হন।

—হ্যাঁ, আমার মার ডান পায়ের পাতা। এবং ঠিক যেই স্থানটিতে ছোবল হানবেন বলে গোখ্‌রোনন্দন স্থির হয়ে বসে আছেন সেই চাঁদমারি থেকে ফর্ণার দূরত্ব বড়ো

জোর ইঞ্চি দশেক কী ফুট। ফণা তুলে মনঃসংযোগ করে বসে আছেন তিনি। রীতিমতো হৃৎকম্পকর পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।

বিনোদবাবু বলেন, অল্পবয়সী ছোকরা সাপ ছিল আর কি। লম্বায় এক ফুট সোয়া ফুট মতো বড়ো জোর। দুধের শিশুই বলা যায়। নেহাতই নাবালক। চঞ্চল, চপল, তরলমতি গোখ্‌রো।

—হ, বুজ্‌ছি। আপনেরে আর কাব্য করতে লাগবো না। কন্ নাই তো এতদিন এই গল্পটা। ফাঁকি দিছেন।

—হ্যাঁ, ঠিক কয়ছেন মেনেজার বাবু। বিনোদদা মানুষডা কিলতুক সুবিধের না।—তবিলদ্দি আমিন যে বিনোদবাবুর উপর যারপরনাই রুষ্ট তা বোঝা যায় তাঁর কথায়।

—হ কও বিনয়, তারপর কী হইল?

—আসলে গোখ্‌রোর বাচ্চাটা এই সুযোগে একটু যাচাই করে নিতে চেয়েছিল যে তার বিষদাঁত যথেষ্ট চোখা কিনা। এবং এক ছোবলে পরিমাণ মতো বিষ ঢালতে পারবে কিনা।

—জাইন্যে কী লাভ ওই চ্যাংড়া গুক্ষুরির? মধুবাবু ফস্ করে প্রশ্নটা করে বসেন আহম্মকের মতো।

—ওই আর কী।—ফুলুবাবু আমল দেয়না এ প্রশ্নের। দেখে তবিলদ্দি খুশি হন। মনে মনে বলেন, বেশ অয়ছে। বালো অয়ছে।

—তারপর?—যদুবাবুর মুখে চোখে উৎকণ্ঠা।

—আহ্‌হা, কতি দ্যান্‌না। ও তো কচ্ছেই গফ্‌প্পোডা। অ্যাতো কথা কলি গফ্‌প্পো কওয়া যায়।—মধুবাবু।

যদুবাবু চুপ করেন।

—হ্যাঁ যা বলছিলাম। গোখ্‌রোটা যা ভেবেছিল তা হয়তো ঠিকই ছিল ওর দিক থেকে, তবে উচিত ছিল ওর এরকম পাঁয়তারা কষার আগে আর একটু অঙ্ক কষার। আর একটু মাথা খাটানোর।

—ক্যান্, এই কথা কও ক্যান তুমি বিনয়? তুমি তো দেখি গোক্ষুরের পক্ষ নিতাছো।

—না না, তা নিচ্ছি না নিশ্চয়ই। আর গোখ্‌রোটা তো আত্মহনন-ই করে বসল শেষ পর্য্যন্ত। পক্ষ নিয়েই বা কী।

—ক্যান্? কীভাবে?

বিনোদবাবু পুত্রের মুখে কথা যোগান। বলেন, ওই যে কথায় আছে না, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে, তা আমাদের সেই ছোক্‌রা সাপও ওইরকম একটা অবস্থার ঘোরে পড়েছিল। ও গিয়েছিল একটু ডেঁপোমি করতে। ফুলুর মাকে চম্‌কে দিতে। তার ক্ষুদ্র ফণা বিস্তার করে দংশন করতে।

—বোঝেন অ্যাখ্‌বার।—শ্যামাপদ-র মুখে চোখে ভয়ের ছাপ।

—কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ ছিলনা। আমার মার অসামান্য উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে সে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত। আর নতি স্বীকার করতে গিয়ে বেচারা তার প্রাণটাই দিয়ে দিল। এবং সে প্রাণবিয়োগের ধরন ছিল যেমন নারকীয় তেমন বীভৎস। চূড়ান্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ভয়ঙ্কর।—ফুলু সাহিত্য করে।

—বাব্বা! হৃৎকম্প হচ্ছে—যদুবাবু বলেন।

—হিদ্‌কম্‌ফো অচ্ছে তো শোনবেন না। কিডা শুনতি কচ্ছে আফ্‌নেক।—মধুবাবুর মুখে চোখে উষ্মা।

—তবে কিন্তু গোখ্‌রোটাকে ওইভাবে মারা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। সেক্ষেত্রে মার প্রাণ সংশয় হত।—ফুলু ঘটনাটাকে রহস্যের রূপ দেয়।

—কীরকম?

—অকালপক্ক ছিল তো ও। ভীষণ অকালপক্ক। ফুলু কথার মধ্যে রস ঢেলে দেয় পরিমাণ মতো। গোখ্‌রোর বিষ ঢালার মতো করে।

—হ্যাঁ, বল তারপর কী হল।—যদুবাবু অধৈর্য।